১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার এক অজপাড়াগাঁয়ে জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

খোকা, মজিবর, শেখ সাব, মুজিব ভাই - নানা নামে ডাকতেন তাঁকে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু, সবার প্রিয় বন্ধু।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার দুই বছরের মাথায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিকল্প হিসেবে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, মানে জনগণের মুসলিম লীগ।

খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু
লড়াই-সংগ্রামের দীর্ঘ কঠিন পথ

প্রভাষ আমিন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। আমরা খুব সৌভাগ্যবান, বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা পেয়েছিলাম। বিশ্বের আরো অনেক দেশ একজন যোগ্য নেতার অভাবে ন্যায্য দাবিও আদায় করতে পারছে না। নেতার দূরদর্শিতার অভাবে স্বাধীনতার আন্দোলনও অভিহিত হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাহসী এবং দূরদর্শী। ন্যায়ের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি। আবার সময়ের আগেও কিছু করেননি। বারবার উস্কানী সত্ত্বেও তিনি বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ভুল পথে যেতে দেননি। এমনকি পাকিস্তানি হানাদারদের আক্রমণের পরেই কেবল স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। আগ বাড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে অভিহিত করার চেষ্টা হতো।

১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ার এক অজপাড়াগাঁয়ে জন্মেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বেঁচেছিলেন মাত্র ৫৫ বছর। কিন্তু জীবন আসলে লম্বা নয়, বড় হওয়াটা জরুরি। মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে একটি জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ঐক্যবদ্ধ করেছেন, মুক্ত করেছেন এবং স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে লড়াই করেছেন। সে লড়াই শেষ হওয়ার আগেই খুনিরা সপরিবারে তাঁকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন পিতার অসমাপ্ত কাজ শেষ করে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় উন্নত ও সমৃদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলার লড়াই করছেন।

বঙ্গবন্ধু যেখানে জন্মেছেন, সেই টুঙ্গীপাড়া একসময় ছিল দুর্গম। পদ্মা সেতুর সুবাদে এখন চাইলে দুই ঘণ্টায় টুঙ্গীপাড়ায় পৌঁছে যাওয়া যায়। একসময় টুঙ্গীপাড়া থেকে ঢাকায় আসতে দিন পেরিয়ে যেতো। সেইরকম একটি জায়গা থেকে উঠে এসে বঙ্গবন্ধু কীভাবে একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘরে পরিণত হলেন, কীভাবে গোটা বিশ্বের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অনুপ্রেরণায় পরিণত হলেন, তা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। বাবা-মায়ের আদরের খোকা পরিণত হলেন বঙ্গবন্ধুতে। এই পথটা ছিল বন্ধুর, ঝুঁকিপূর্ণ, দীর্ঘ লড়াই আর সংগ্রামের। খোকা, মজিবর, শেখ সাব, মুজিব ভাই - নানা নামে ডাকতেন তাঁকে। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির পর থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু, সবার প্রিয় বন্ধু।

টুঙ্গীপাড়া থেকে শেখ মুজিব পড়াশোনা করতে কলকাতা গিয়েছিলেন। ভর্তি হয়েছিলেন ইসলামিয়া কলেজে, এখন যেটি মৌলানা আজাদ কলেজ। বঙ্গবন্ধু থাকতেন বেকার হোস্টেলে। বছরখানেক আগে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর

স্মৃতিবিজড়িত ইসলামিয়া কলেজ আর বেকার হোস্টেল ঘুরে এসেছি। দেখতে দেখতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি, এই জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের বিকাশ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক।

কলকাতা থাকতেই বঙ্গবন্ধু অংশ নিয়েছেন পাকিস্তান আন্দোলনে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরপরই শেখ মুজিব বুঝে যান, এই স্বাধীনতা আমাদের নয়। ব্রিটিশদের বদলে পাকিস্তানিরা শাসক বনে যায়। বাঙালির ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। বরং পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের ভাষার ওপর, আমাদের সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও শাসন করার অধিকার দূরের কথা, আমাদের ভাগ্যে জোটে পদে পদে বঞ্চনা। শুরু হয় বঙ্গবন্ধুর লড়াই। ৪৭ থেকে ৭১ - ২৩ বছরের মুক্তিসংগ্রাম আর ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা জুড়েই বঙ্গবন্ধু বিরাজমান। এই ২৩ বছরের ১৩ বছরই বঙ্গবন্ধুর কেটেছে কারাগারে। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানের কারাগারের নির্জন সেলে বন্দি রাখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। সেলের পাশেই খোঁড়া হয় কবর। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কখনো মৃত্যুকে ভয় পাননি। বারবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। মুক্তি পেয়ে জেল গেট থেকে আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু কখনো আপস করেননি। বাঙালির মুক্তির প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার দুই বছরের মাথায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিকল্প হিসেবে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, মানে জনগণের মুসলিম লীগ। তরুণ শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ পরিণত হয় আওয়ামী লীগে, মানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সংগঠনে। আর আওয়ামী লীগের বিকাশ ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই। বাঙালির ২৩ বছরের মুক্তি সংগ্রামের অনেকগুলো ধাপ - ৫২র ভাষা আন্দোলন, ৬২র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬র ৬ দফা, ৬৯এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০এর নির্বাচন আর ৭১এর মুক্তিযুদ্ধ। ধাপে ধাপেই বঙ্গবন্ধু একটি জাতিকে স্বাধীনতার মোহনায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল সনদ আসলে ৬ দফা। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনের প্রথম দিনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা পেশ করেন। এই ৬ দফাই ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এই ৬ দফাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় আন্দোলন-সংগ্রাম। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফা দাবির পক্ষে দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতালে টঙ্গী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআরের গুলিতে মনু মিয়া, শফিক, শামসুল হক, মুজিবুল হকসহ মোট ১১ জন বাঙালি নিহত হন। ৬ দফা মূলত স্বাধীনতার এক দফা ছিল। ছয় দফার মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাধীনতার বীজ।

পাকিস্তানিরা বুঝে গিয়েছিল, এই ৬ দফা বাঙালির মুক্তির সনদ হলেও পাকিস্তানের মৃত্যু সনদ। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ৬ দফাকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নেতা হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা করা হয়। আইনী প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার অভিযোগ আনে - শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকজন রাজনীতিক, সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা এবং কয়েকজন সাধারণ সৈনিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জনকে আসামি করা হয়। সবাইকে পাকিস্তানি সরকার গ্রেপ্তার করে। এই মামলাই পরিচিতি পায় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে।

কিন্তু ঘটনা হয় উল্টো। শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে সরাতে যে মামলা করা হয়, সেই মামলাই তাঁকে জনগণের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন গড়ে দেয়। প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তারের পর ফুঁসে ওঠে বাংলার মানুষ। তৎকালীন শাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে রাজপথে নামে ছাত্র-জনতা। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ১৯৬৯এর ৪ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু কার্যালয়ে তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এই ১১ দফায় ছিল ৬ দফাও। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে হত্যা করে। পরে সান্ধ্য আইন জারি করে সামরিক সরকার। কিন্তু সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করে ছাত্রসমাজ।

১৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানি সেনারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকেও হত্যা করে। ওই হত্যাকাণ্ডের পর আইয়ুব খান আবার সান্ধ্য আইন জারি করেন। এর প্রতিবাদে ২০ ফেব্রুয়ারি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয় ঢাকা। আইয়ুব খান তখন সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করে নেন। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে পল্টনে শেখ মুজিবুর রহমানসহ গ্রেপ্তার করা সব রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেয় 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। আর ওই আলটিমেটামে বাধ্য হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবসহ সব রাজবন্দিকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে করতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

গণঅভ্যুত্থানে মুক্তির পরদিন ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা দেয়। সেখানেই তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। সেদিনের গল্প শোনা যাক তোফায়েল আহমেদের মুখেই, "বঙ্গবন্ধুকে সেদিন আমি 'তুমি' বলে সম্বোধন করে বলেছিলাম, প্রিয় নেতা তোমার কাছে আমরা ঋণী, বাঙালি জাতি চিরঋণী। এ ঋণ কোনোদিনই শোধ করতে পারব না। সারা জীবন এ ঋণের বোঝা আমাদের বয়ে চলতে হবে। আজ এ ঋণের বোঝাটাকে একটু হালকা করতে চাই জাতির পক্ষ থেকে তোমাকে একটা উপাধি দিয়ে। এরপরই বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। লাখ লাখ লোক তুমুল করতালির মধ্যদিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে ধ্বনি তুলেছিলেন, 'জয় বঙ্গবন্ধু'।"

তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, "আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সেদিন ১০ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পূর্ণ। সেই জনসমুদ্রের মানুষকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যে নেতা জীবনের যৌবন কাটিয়েছেন পাকিস্তানের কারাগারে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন, সেই প্রিয় নেতাকে কৃতজ্ঞ বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে একটি উপাধি দিতে চাই। ১০ লাখ মানুষ যখন ২০ লাখ হাত উত্তোলন করেছিল, সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। তখন প্রিয় নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই উপাধি জনপ্রিয় হয়েছে, জাতির পিতার নামের অংশ হয়েছে এবং আজকে তো শুধু 'বঙ্গবন্ধু' বললে সারা বিশ্বের মানুষ এক ডাকে চেনে।"

এভাবেই দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে খোকা থেকে মজিবর, মজিবর থেকে মুজিব ভাই, মুজিব ভাই বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রভাষ আমিন, *হেড অব নিউজ, এটিএন নিউজ*